Registered

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি.......... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
২৬ নভেম্বর দিল্লির রাজপথে আর-এস পি'র গণবিক্ষোভ অবস্থান	১
দেশে বিদেশে	২
ভীমা কোরেগাঁও আন্দোলন....	৩
কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন	৩
ডিভিসিতে....ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন	৪
প্রয়োজন...আপসহীন নেতৃত্ব	৫
কম. অবনী রায়ের জীবনাবসান	৬
গণআন্দোলনের মূলমন্ত্র	৭
জলবায়ু পরিবর্তন....কৃষিব্যবস্থা	৮

68th Year 39th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 4th Dec. & 11th Dec. 2021 Joint Issue

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র ধ্বংসকারী আফস্পা প্রত্যাহার করতে হবে

প্রচণ্ড অবিশ্বাস, দেশের নাগরিকদের ওপর সীমাহীন সন্দেহ, দেশদ্রোহী এবং সন্ত্রাসবাদী বলে দাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি পরিকল্পিত বিদ্বেষ নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের দেশে সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী তথা সামরিক বাহিনীর এবং আপামর জনগণের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য দেওয়াল গড়ে তুলেছে আমাদের দেশের শাসক গোষ্ঠী। দীর্ঘদিন নাগাল্যান্ডে কোনো রক্তপাত বা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে কোনো প্রাণহানি না হওয়া সত্ত্বেও দেশের আধা সামরিক বাহিনী সাধারণ নাগরিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতটা সন্দিহান হতে পারে তারই জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্য নাগাল্যান্ডে ১৪ জন নিরীহ গ্রামবাসী ও দিনমজুরদের নির্বিচারে হত্যার মধ্যেই স্পষ্ট।

বহু বছর ধরেই সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পার গণতন্ত্র নিধনকারী অমানবিক চরিত্রের পরিচায়ক। সেই কারণেই এটিকে সরাসরি প্রত্যাহারের দাবি করেছে বামপন্থীরা এবং অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দল সহ দেশবিদেশের নাগরিক অধিকার তথা মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠনসমূহ।

দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠনকারী এই আফস্পা আইনটি তো বটেই, ভারতের সংবিধানকে সামান্যতম মর্যাদা দিতে গেলে অনেক আগেই ইউ এ পি এ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আইনগুলি প্রত্যাহার একান্ত জরুরি।

আফস্পা আইনে সশস্ত্র বাহিনী যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত, নথিপত্র ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার, এমনকি, কোনো ব্যক্তির গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিহান হলে তাঁকে সরাসরি হত্যা করার অধিকার পর্যন্ত রয়েছে। এভাবে ব্যক্তিগত অধিকার হরণ, সম্মানহানি, সম্পত্তি দখল ও হত্যার বিরুদ্ধে ন্যূনতম সাংবিধানিক অধিকারকে ঢাল করে আইনি লড়াই-এর বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সন্ত্রাস, বিদ্রোহ, গণঅভ্যুত্থান বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত করার নৈতিক এবং আইনি অধিকার সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ভারতকে একটি সামরিক তথা ফ্যাসিবাদ অভিমুখী রাষ্ট্রে অবনমিত করা হচ্ছে। এই অবস্থায় সংবিধানের মূলমন্ত্র ধ্বংসকারী রাষ্ট্র ছাড়া আর কী বা বলা যায়? এর বিরুদ্ধে কোনরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে আইনি লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও আফস্পা আইন প্রয়োগ করার জন্য যেভাবে সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিকতাকে চরম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার অজস্র প্রমাণ শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়, কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

আফস্পা প্রত্যাহার শুধু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার জন্যই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ন্যূনতম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে সুরক্ষিত করা এবং তথাকথিত উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষের জীবনের অন্ধকারের স্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন। বিশেষ করে নাগা বিদ্রোহ প্রশমিত করার জন্য যে নিপীড়ন, বিভেদপন্থার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—সেই স্মৃতি অবলুপ্ত না করতে পারলে এই হিংসাত্মক অধ্যায় অসমাপ্ত থেকে যাবে।

ভারতের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সামরিক রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে অজস্র ক্ষুদ্র জনজাতি এবং সংখ্যালঘুদের 'অপর' বলে চিহ্নিত করে প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী সংবিধানের মূলনীতি ধ্বংস করে চলেছে। 'তোমরা এই সংবিধানের চুক্তি ভঙ্গ করছ', 'রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনী চুপ করে থাকতে পারে না'—এই তাদের ফ্যাসিবাদী যুক্তি।

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই শুধু আধাসামরিক বাহিনী নয়, সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ভারতকে হিন্দু সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করার অপচেষ্টা চলছে জোর কদমে। প্রয়োজনে দরিদ্র ঘর থেকে আগত সেনাবাহিনীর সাধারণ স্তরের সৈনিকদের নির্বিচারে তথাকথিত 'ছদ্ম দেশপ্রেমের' সম্মোহে আবিষ্ট করে ক্রমে অসহায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং দেশের কৃষক সমাজের মতো সারা দেশ জুড়ে আওয়াজ উঠুক ''আফস্পার মতো আইন গণতান্ত্রিক ভারতকে সর্বনাশের পথে চলতে প্ররোচনা দিচ্ছে, একে অবিলম্বে গোড়া শুদ্ধ উপরে ফেলতে হবে।''

একক উদ্যোগে

২৬ নভেম্বর দিল্লির রাজপথে আর এস পি'র গণবিক্ষোভ অবস্থান

২৬ নভেম্বর দিল্লির সমাবেশের একাংশ

মোদি সরকারের কর্পোরেটরাজ কায়েমের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল নয়াদিল্লির যন্তর মন্তর। ২৬ নভেম্বর আর এস পি'র আহ্বানে 'ভারত বাঁচাও' ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ দেশের রাজধানী দিল্লির সমাবেশে যোগ দেন। পূর্বে অসম থেকে পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে কেরল, তামিলনাড়ু— মোট তেরোটি রাজ্য থেকে মানুষ আর এস পি'র সংসদ অভিযানে সামিল হন। বিক্ষোভে উত্তাল।

আর এস পি'র এই সংসদ অভিযানকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে দেশজুড়ে চলে প্রচার। রাজ্যে রাজ্যে চলে সভা, মিছিল, দেওয়াল লিখন, মাইক প্রচার প্রভৃতি। কেরল রাজ্যের চোদ্দটি জেলা অন্ততপক্ষে দুশোর বেশি পথসভা এবং জাঠার কর্মসূচি পালিত হয়। তেলেঙ্গানাতেও অনেকগুলি সভা হয়েছে। প্রচার পুস্তক নিয়ে কমরেডরা পৌঁছে যান মানুষের কাছে। এরই মধ্যে তিনটি জনবিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সংসদ অভিযানে বাড়তি উৎসাহ জোগায়। অপরদিকে সমাবেশ বানচাল করতে মোদি সরকারের দিল্লি পুলিশ চেষ্টার ত্রুটি করেনি। মেলেনি মিছিলের অনুমতি। যন্তর মন্তরে সমাবেশ নিয়েও নানা বিধিনিষেধ। এমনকি, দিল্লি মহানগরের নানা প্রান্তে পোস্টারও ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ২৬ নভেম্বর চলল নানা অজুহাতে কমরেডদের হেনস্থা। দলবদ্ধভাবে আসার পথে বিভিন্ন স্থানে আটকেছে পুলিশ। যেন দিল্লিতে এখন একসঙ্গে হাঁটার বা যাতায়াতের নিয়ম নেই। রাজধানী জুড়ে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা।

প্রশাসনিক বাধা জেদ বাড়িয়েছে আর এস পি কমরেডদের। নির্ধারিত সময়ের আগেই কমরেডরা যন্তর মন্তর চত্বরে হাজির হতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্যের মাঝে স্লোগানে মুখরিত ছিল যন্তর মন্তর। পাঞ্জাবের কৃষক নেতা থেকে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়েছেন কমরেডরা। আবার বাংলার কৃষক নেতার থেকে জানতে পেরেছেন তথাকথিত মোদি বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের নির্লজ্জ কর্পোরেট তোষণ নীতির কথা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি যে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ তা ব্যাখ্যা করে বলেন অনেকেই।

শ্রমিক নেতাদের বক্তব্যে শ্রম বিধি বাতিলের দাবি, যুব নেতার কাজের, ছাত্র নেতার জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি বা মহিলা নেত্রীর আর এস এস-এর মনুবাদী, নারীবিদ্বেষী কর্মসূচি প্রতিরোধের ডাকে যন্তর মন্তর উদ্বেলিত হয়েছে।

সমাবেশের শুরুতে আর এস পি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কম. অবনী রায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কম. পরিতোষ চন্দ এবং কৃষক আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সমাবেশে আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, কর্পোরেটরাজ কায়েম করতে মোদি সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। করোনা অতিমারির মোকাবিলা না করে সেই সুযোগে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করার পথ গ্রহণ করেছে। কৃষি আইন, শ্রম বিধি, বিদ্যুৎ আইন প্রভৃতি সেই লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে। দেশের সম্পদ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেচে দেওয়া হচ্ছে। নির্বিচারে উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে পেট্রোজাত পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হয়েছে। জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। ভর্তুকি তুলে দিয়ে, জি এস টি চালু করে সমস্ত জিনিসের দাম আরও বাড়ানো হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে। বিগত চোদ্দ বছরে এমন বিপর্যয় আর হয়নি। একদিকে জি এস টি বাড়ছে, অপরদিকে কর্পোরেট কর কমছে। সাধারণ মানুষ যখন আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত, তখন কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বেড়েই চলেছে। আদানি আম্বানির একান্ত দালাল হিসেবে মোদি-শাহ সক্রিয়। নয়া উদারনীতির স্বার্থেই গণতন্ত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। একের পর এক অগণতান্ত্রিক আইন ও মিথ্যা মামলাকে অস্ত্র করে সরকার প্রতিবাদী কণ্ঠ বন্ধ করতে চাইছে। সংখ্যালঘু, দলিত, নারীদের ওপর চলছে লাগাতার আক্রমণ। কম. ভট্টাচার্য উপস্থিত কমরেডদের বলেন যে, লড়াই জারি রাখতে হবে। মজুতদারি, কর্পোরেটরাজের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

এরপর ৪-এর পাতায়

উত্তপ্ত ইউক্রেন-রাশিয়া সীমান্ত

ইউক্রেনের অভিযোগ যে কোনও মুহূর্তে রাশিয়া তাদের দেশে হামলা চালাতে পারে। সি এন এন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ, রাশিয়া, ইউক্রেনের সীমান্তে সম্ভাব্য অভিযানের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ২০২২-এর গোড়াতেই রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান শুরু হতে পারে — এমন আশঙ্কা বেশ প্রবল। রাশিয়ার ১০০ ব্যাটেলিয়ান Tactical Group -এর অন্তর্ভুক্ত ৯৫,০০০-১, ০০,০০০ রাশিয়ান সৈন্য ইউক্রেন সীমান্তে অবস্থান করছে। ইউক্রেনে আক্রমণের জন্য উপর মহলের নির্দেশের অপেক্ষায় এই বিপুল সংখ্যক রাশিয়ান সৈন্য। প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া রাশিয়ার হাত ছাড়া হয়েছিল। পুটিনের রাশিয়া সম্ভবত ইউক্রেনে আর জমি ছাড়তে রাজি নয়, তাই হয়ত রাশিয়ার এই ইউক্রেন অভিযানের পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক মহলের জল্পনা রাশিয়া যদি সত্যিই ইউক্রেন অভিযান শুরু করে, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী এক যুদ্ধ চলতে পারে। ইউক্রেন হতে পারে রাশিয়ার দ্বিতীয় আফগানিস্তান। অথবা কিয়েভে এক অচলাবস্থা তৈরি করে রাশিয়া পশ্চিমী দেশগুলি থেকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ইউক্রেন অভিযানের হুমকি দিচ্ছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইউক্রেনের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসার কথা। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপের চার দেশ ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালি ও জার্মানির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাইডেন ফোনে কথা বলেছেন, আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্রধানদের আলোচনায় উঠে এসেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার দিকগুলি। হোয়াইট হাউস সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের প্রতি রাশিয়া আগ্রাসন নীতি বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা কঠোর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারে। সেই সঙ্গে পুটিন ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞা চাপানোর কথাও বাইডেন প্রশাসন চিন্তা করছে বলে জানা গিয়েছে। রাশিয়ান বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে পারে।

ওমিক্রন সম্পর্কে আশার বাণী

আমেরিকান শীর্ষস্থানীয় সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউচি ওমিক্রন সম্পর্কে জানাচ্ছেন, নতুন চেহারায় করোনার নয়া সংস্করণ ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি হলেও মারণ ক্ষমতা তেমন বেশি নেই। ফাউচি বলেন; এ পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছে। করোনার এই নতুন সংস্করণ ওমিক্রনের বিষয়ে বেশিরভাগটাই অজানা হলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীদের বাড়াবাড়ি হওয়ার কোনও খবর এখনও পাওয়া যায় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় অল্পবয়সীদের মধ্যেই বেশি আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। আশঙ্কা ছিল, বেশ বড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও দুসংবাদ নেই, যে ৩০ টি দেশে ওমিক্রন আক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে, কোথাও কোনও বিপদের খবর নেই।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, করোনার ডেল্টা স্ট্রেনের জায়গা নিতে চলেছে ওমিক্রন। এই স্ট্রেনটির মারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় হয়ত এবারের মতো সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস জনিত বিপদ থেকে রক্ষা পেলেও, আবার কোনও ভয়ঙ্করতর অতিমারির কবলে পড়তে পারে বিশ্ব এবং এই অতিমারি থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের তৈরি থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনৈক প্রাক্তন কর্মী বলছেন, ওমিক্রনের সংক্রমণ অন্যান্য ভেরিয়েন্টের তুলনায় কম ক্ষতিকারক হলে, আগামী জুনেই মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

মায়ানমারের জননেত্রী নোবেল জয়ী আউং সান সু চি'র চার বছরের কারাদণ্ড

ইয়াঙ্গন, ৬ ডিসেম্বর, কোভিড বিধি ভেঙ্গে নির্বাচনী প্রচার চালানো এবং জনরোষে মদত দেওয়ার অভিযোগে আউং সান সু চি-কে মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার নিয়ন্ত্রিত আদালত চার বছরের কারাদণ্ড দিল। ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী সুচির বিরুদ্ধে আনা ১১টি অভিযোগ প্রমাণিত হলে ১০২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে সু চি'র। সু চি ছাড়া জুন্টার হাতে বন্দি অন্যান্য নেতাদেরও বিচারের প্রক্রিয়া চলছে সম্পূর্ণ গোপনে। বিদেশি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সাধারণ মায়ানমার বাসীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়া। সাজা ঘোষণার পর সু চিকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত রোহিঙ্গা সমস্যায় সু চির অস্বস্তিকর ভূমিকার কারণে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় শান্তির জন্য নোবেল জয়ী সু চি জনপ্রিয়তা হারালেও, এভাবে গোপনে তাঁকে জেলে পোরাকে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আসিয়ান গোষ্ঠীর মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মায়ানমারের জুন্টা সরকার যে ভাবে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়েছে তা অত্যন্ত হাস্যকর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলিকে এক জোট হয়ে এই প্রহসনের মোকাবিলা করা দরকার।

২০২০ সালের ৮ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সু চি'র দল বিপুল সংখ্যক আসন পেয়ে জয়ী হয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারের সময় সু চি একদিন তাঁর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে-ছিলেন, কোনও জন সমাবেশ না হলেও গৃহবন্দি সু চি বাড়ি থেকেই মুখোশহীন অবস্থায় পথ চলতি মানুষকে অভিবাদন করায় কোভিড বিধি লঙ্ঘনের হাস্যকর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন সু চি।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

হাসিনা জমানায় ভারত ও বাংলাদেশ পরস্পরের অনেকটা কাছে এসেছে। সোমবার ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের স্বীকৃতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ফোরাম ফর সেকুলার বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের মধ্যে অবাধ চলাচলের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সবার উন্নয়নের স্বার্থে এই দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ানো উচিত।

১৯৭১-র ৬ ডিসেম্বর মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর পর আসে ভুটানের স্বীকৃতি। এই দিনটিকে 'মৈত্রী দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ও দিনটি দেশে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে দিল্লি এবং ঢাকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুদের নিষ্ক্রিয় করতে এই দিনটির বিশেষ মর্যাদা থাকা উচিত বলে মনে করে ফোরাম ফর সেকুলার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ঢাকায় ভারতের উপস্থিতিতে এই দিনটি গত দেড় দশক ধরে উদযাপিত হচ্ছে। ৬ ডিসেম্বরের সভায় ভারতের হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এই দিনটির উদযাপন এক দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল বলে মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত মৈত্রী দিবসের এই সভায় পাকিস্তানের মদতে উপমহাদেশে জঙ্গিবাদের বাড়াবাড়ি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

৮ ডিসেম্বর—আজই কী কৃষক আন্দোলন উঠতে চলেছে?

সব ঠিকঠাক চললে ৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারই গণআন্দোলনের ইতিহাসে দীর্ঘতম কৃষক আন্দোলনের উপর যবনিকা পড়তে চলেছে। কৃষকদের প্রধান দাবি তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করতে মোদী সরকার বাধ্য হলেও, আরও ছ'টি দাবি সম্পর্কে কোনও ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে কৃষক আন্দোলন চলছিল, পাঁচটি দাবিতে শেষমেষ ইতিবাচক সাড়া পেয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার অধীন কৃষক সংগঠনগুলি আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এম এস পি'র আইনি গ্যারান্টি প্রসঙ্গে সরকারের প্রস্তাব সব চাষিদের জন্য এম এস পি নিশ্চিত করতে কৃষক মোর্চার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কমিটি তৈরি হবে। এখন সরকার যে পরিমাণ ফসল কেনে তা কমবে না এমন আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। তবে লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যাকাণ্ডে মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তার বরখাস্তের দাবিটি অসীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী মোদী সরকার বাধ্য হয়ে কৃষক আন্দোলনের ছয় দফা মেনে নিয়েছে।

নাগাল্যান্ডে সেনা কম্যান্ডোর নির্মম হত্যাকাণ্ড

নাগাল্যান্ডে সেনা কম্যান্ডোর নির্মম হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশ আলোড়িত। গত এক দশকে এত বড় নৃশংস কাণ্ড ঘটেছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, সেনা কম্যান্ডোর নৃশংস আচরণের জন্য যারা দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত উত্তর-পূর্বে পুরানো মহাতঙ্ক আবার ফিরে এসেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা সেনা কর্তৃপক্ষ ঘটনার যে সাফাই দিক না কেন, এই ঘটনা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিবাদীদের প্রতিবাদ আরও কঠিন হবে। নাগরিকরাও নিজেদের আরও অনিরাপদ ও অবহেলিত মনে করবেন। এই ভয়ঙ্কর দুষ্কার্যের ব্যাখ্যা; ভুল স্বীকার বা ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়, কেন এমন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে তার নির্মোহ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আসলে দমনের রাস্তা খোলা থাকলে, আফস্পা সদৃশ আইন প্রত্যাহার না করলে, এমন ঘটনার পথও অবারিত থাকতে পারে তা নিয়ে বোধ হয় কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। ভারতের দুই প্রান্তে একই পরিস্থিতি— সেনাবাহিনীকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দানের ফলে যা ঘটার কথা তাই ঘটে চলেছে। কাশ্মীর এবং উত্তর পূর্ব ভারতের নাগরিক সমাজ শাসককুলের যদৃচ্ছ শাসনের জন্য ক্রমশ আরও বেশি করে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা কখনই কাম্য হতে পারে না।

নাগরিকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালনা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। যে ভাবে জঙ্গি দমন করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে অসামরিক নাগরিক সমাজের উপর গুলি বর্ষণ করা যায় না। কোনও আন্দোলনে আসামরিক নাগরিক সম্মুখে থাকলে গুলি চালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দেশে নিষেধ থাকে অন্তত বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। ভারতীয় সেনার ক্ষেত্রে এমন নির্দেশ বিধি স্পষ্ট নয়। এমন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট নির্দেশাবলীর দায় সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রেরও। ক্ষমতাসীন শাসককুলের কাছে নাগরিক সমাজের জিজ্ঞাসা, আফস্পার মত ভয়ঙ্কর দমনমূলক আইনে সেনাবাহিনীর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া কি সফল রণনীতি? নিরাপত্তার কাজে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষকদের বদলে সেনাবাহিনীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করাটা কি আদৌ জরুরী? পুঁজির যুক্তিতে, পুঁজির অনুশাসনে প্রার্থিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার এই সংগত প্রশ্নগুলি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এমন আশা দুরাশামাত্র। প্রসঙ্গত সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। নাগা শান্তি চুক্তিও বাতিল হওয়ার মুখে। নাগাল্যান্ডে সেনা কম্যান্ডোর গুলিতে শ্রমিক গ্রামবাসীদের মৃত্যুর পর শান্তিচুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আলোচনা আর এগোবে কিনা তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সংশয় তৈরি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আশঙ্কা মন জেলায় গুলি চালানোর ঘটনা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির তৎপরতা এবং যুবকদের জঙ্গিদলে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে শান্তি চুক্তিতে সাফল্যের সম্ভাবনা আপাতত বিশ বাঁও জলের নীচে বলে মনে হতেই পারে। এদিকে উত্তর পূর্বের একাধিক রাজ্যে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি ওঠায় মোদী সরকার অস্বস্তিতে। নাগাল্যান্ড ছাড়াও, মেঘালয় বা মিজোরামের মতো রাজ্যগুলিতে বিজেপি সরকার শাসনে থাকা সত্ত্বেও আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।

ভীমা কোরেগাঁও আন্দোলনে অভিযুক্ত সুধা ভরদ্বাজ জামিনে মুক্ত

দীর্ঘ তিন বছর কারাবন্দি থাকার পর অবশেষে জামিনে মুক্ত হলেন বিশিষ্ট আইনবিদ এবং প্রখ্যাত সমাজকর্মী সুধা ভরদ্বাজ। তাঁকে ভীমা কোরেগাঁও আন্দোলনে এলগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ইউ এ পি এ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় সর্বধরনের তদন্ত করেও কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। নিছক সন্দেহের বশে একজন বয়স্কা ও কৃতি মহিলাকে এতকাল কারাবন্দি করে রাখা হল। এন আই এ বহুভাবে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করে গেছে। কিন্তু একান্তভাবে সাজানো মামলায় কোনভাবেই তদন্তকারীরা এগোতে পারেনি।

১৮১৮ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় ভীমা কোরেগাঁও অঞ্চলে পশ্চাদপদ মাহার জাতির সেনাদের কাছে উচ্চ জাতির পরাজয় হয়। দ্বিতীয় বাজিরাও-এর বাহিনীকে পরাস্ত করার এই দিনটি পিছিয়ে পড়া বা দলিত সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ গর্ব করার দিন। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকারের নেতৃত্বে এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপিত হতে শুরু করে সমারোহ সহকারে। পুনে বা মহারাষ্ট্রের উচ্চ জাতিভুক্ত মানুষদের অনেকের কাছে দলিত সম্প্রদায়ের এই উদ্‌যাপন মোটেই পছন্দের নয়। তাঁরা নানাভাবেই এই উৎসব বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোবিন্দ গোপাল মাহারের স্মৃতিসৌধটি ধ্বংস করার অপচেষ্টা হয়। এই গর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরের ৩১ ডিসেম্বর এলগার পরিষদের আহ্বানে একটি বিশাল প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়েছিল। উচ্চবর্ণের বিশেষ অংশ এই সভা আয়োজনের সঙ্গে মাওবাদীদের কল্পিত সংস্রব আবিষ্কার করে।

উগ্র অতি জাতীয়তাবাদী মোদী সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে পুনে জেলায় বেশ জোরালো ভাবেই জাতি দাঙ্গার পরিবেশ নির্মিত হয়। এই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংগঠনই পুনের সুপরিচিত চিকিৎসক এবং অন্ধ সংস্কার বিরোধী যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা ডা. নরেন্দ্র দাভোলকারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এরাই ভীমা কোরেগাঁও স্মৃতিসৌধ ধ্বংসের চক্রান্ত করে।

মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের মদতে এবং ষড়যন্ত্রের ব্যাপক আয়োজনে এবং প্রায় ৩০০ জন দলিত মানুষ এবং তাদের সহযোগী হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সমাজকর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক গৌতম নওলাখা তেলুগু কবি ভারভারা রাও, বয়স্কা অধ্যাপিকা সোমা সেন, আনন্দ তেলতুম্বড়ে, রোজা উইলসন, সুধীর ধাওলে, ভারনন গঞ্জালভেজ, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং প্রমুখর সঙ্গেই ছত্তিশগড়ের দলিত শ্রেণির অত্যাচারিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার আন্দোলন দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ নিবিড়ভাবে যুক্ত আইনজ্ঞ সুধা ভরদ্বাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। অল্প কিছুকালের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ নেতা জেসুইট ৮৩ বছরের স্ট্যান স্বামীকেও গ্রেপ্তার করে মহারাষ্ট্রের তালোজা জেলে নিষ্ঠুরভাবে বন্দি করা হয়।

পারকিনসনের প্রকোপে নিদারুণ অসুস্থ স্ট্যান স্বামীকে তাঁর ব্যবহারের চশমা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। জল পর্যন্ত সিপার বা স্ট্র ছাড়া খেতে পারতেন না। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁকে তাও দেওয়া হয়নি। স্বাধীন ভারতে এত বেশি বয়স্ক কোনও মানুষকে অতীতে এভাবে জেলবন্দি করা হয়নি। তাঁর জামিনের আবেদনও অস্বীকৃত হয়েছিল। ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ বঞ্চিত এই সমাজকর্মী বন্দি অবস্থাতেই ৮৪ বছর বয়সে গত ৫ জুলাই প্রয়াত হন। অমানবিকতার চরম নিদর্শন।

সুধা ভরদ্বাজ সহ সকলেরই এক অপরাধ। এরা সবাই কোনও না কোনও সময়ে নরেন্দ্র মোদীর অনৈতিক আচরণের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সক্রিয় এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নেমে আসে। এতদিনে সুধা ভরদ্বাজ জামিন পেলেন কিন্তু বাকী অন্য সব বন্দিকে অকারণে আটক রাখা হয়েছে। এমনভাবে ন্যূনতম মানবিক অধিকার দেশের সর্বত্র হরণ করা হচ্ছে। গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত নাগরিকের এমন অসহ্য ফ্যাসিবাদী সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই হবে। মোদী-শাহ'র চরম অনৈতিকতাকে রুখতে না পারলে দেশের সাধারণ মানুষ কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পারবেন না।

ভাবতেও অস্বস্তি হয় যে, দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি কাল আগে ইংরেজ ঔপনিবেশিক অপশাসনের নাগপাশ থেকে ভারত মুক্ত হয়েছে অথচ ভারতের স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করা হত যে দেশদ্রোহিতার আইনে, সেই আইন এখন মোদী সরকার নির্বিচারে প্রয়োগ করে চলেছে। দেশ ও রাষ্ট্রীয় সরকারকে এক করে দেখা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতিতে সরকারের সমালোচনা হতেই পারে। গণতন্ত্রের সংবিধানসম্মত নিদান অনুযায়ী যে ইটারনাল ভিজিল্যান্সের কথা বলা হয় তা, মোদী-শাহ'র অপশাসনকালে বাতিল হয়ে গেছে। সরকারের সমালোচনাকে দেশদ্রোহিতা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের বাকস্বাধীনতা ক্রমাগত খর্ব করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি আইন এখন মোদী সরকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মোদী ঘনিষ্ঠ জনৈকা অভিনেত্রী ইদানিংকালে দাবী করেছেন যে, ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এসেছে ২০১৪ সালে, ১৯৪৭-এ নয়! যথার্থই বলেছেন এই মহিলা! উগ্র হিন্দুত্ববাদ নির্ভর ফ্যাসিবাদী শাসন প্রবর্তন করা মোদীর মতো অপশাসনের যা খুশি করার স্বাধীনতা অবশ্যই ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকার পরিচালিত। এই সরকারের নেপথ্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আর এস এ'র হাতে। দেশকে বাঁচাতে গেলে এই সরকারের দ্রুত পরাভব একান্ত জরুরি।

কলকাতা-কর্পোরেশন নির্বাচনে বামফ্রন্টের আবেদন

দুয়ারে হাঁটুজল। সেই জল ভেঙ্গেই হাঁটছে কলকাতা। বৃষ্টি হলেই নিয়ম করে ডুবছে শহর। আর, জল কমছে মাটির তলায়।

কলকাতা কর্পোরেশনের ভোট হচ্ছে, এটাই বড় ব্যাপার। কারণ মানুষের মতামত প্রয়োজন কাজ করার জন্য। মানুষের চাহিদা, মানুষের সমস্যা বোঝার জন্য। তোয়ালে মুড়ে ঘুষ নেওয়ার জন্য জনগণের দরবারে হাজির হতে হয় না। কাটমানি আর তোলাবাজির রাজত্বে ওয়ার্ড কমিটি উধাও হয়ে যায়।

কাটমানির প্রকল্পে আলো হচ্ছে রাস্তায়। আর কালো হচ্ছে বাতাস। গোটা দুনিয়ার দূষিত শহরের মধ্যে প্রথম সারিতে আছি আমরা। দশ বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গাছ কাটা হয়েছে এই শহরে। ভরাট করা হয়েছে প্রায় তিন হাজারের বেশি জলাশয়। সেই জমিতেই তৈরি হচ্ছে বহুতল, বেআইনিভাবে। আর এই বেআইনি নির্মাণের বেআইনি টাকাতেই ভোট লড়বে তৃণমূল।

কর্পোরেশনের কাজ কী? তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কর্পোরেশনের কাজ করবে কে? কলকাতা কর্পোরেশনের স্থায়ী পদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ফাঁকা পড়ে আছে। যার সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এত লোককে স্থায়ী কাজ দিতে পারে কর্পোরেশন। কিন্তু, লেবার কন্ট্রাক্টরের টাকায় চলা তৃণমূল পার্টি ক্ষমতায় থাকলে তা আর হওয়ার নয়।

১৯ ডিসেম্বর কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থী তালিকা

১৪ নং ওয়ার্ড
কম. স্বপন কুমার ঘোষ
১৫ নং ওয়ার্ড
কম. দীপা সাহা
৪০ নং ওয়ার্ড
কম. কাবেরী ভট্টাচার্য
৫১ নং ওয়ার্ড
কম. সুনেত্রা ওঝা
৬৫ নং ওয়ার্ড
কম. অনুলেখা সিনহা
৯৪ নং ওয়ার্ড
কম. বুলা শীল
৯৯ নং ওয়ার্ড
কম. শিখা মুখার্জী
১০৪ নং ওয়ার্ড
কম. ধীরাজ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
১০৬ নং ওয়ার্ড
কম. অলোক চ্যাটার্জী

কলকাতায় এখন কাজ মানে অস্থায়ী, ঠিকা। একশোদিনের কাজ থেকে ডেলিভারি, রুজি কম কিন্তু জিনিসের দাম বেশি। কাজের সময়ের ঠিক নেই, ছুটি নেই, সামাজিক সুরক্ষা নেই। আছে টেনশন। আছে অনিশ্চয়তা।

দাম বাড়ছে সবকিছুর। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে মানে বাড়ছে পরিবহনের খরচাও। দিল্লী ও নবান্নের সৌজন্যে বাজারে আগুন। ফোন স্মার্ট হচ্ছে, আর আমাদের বোকা বানানো হচ্ছে। আমি হিন্দু হব না মুসলিম, আমি পুরুষ হব না মহিলা, আমি বাঙালি হব না বিহারি, কোনোটাই আমি নিজে ঠিক করিনি। অথচ তার ভিত্তিতেই ছড়ানো হচ্ছে বিদ্বেষ। পাড়ার মোড়ে, বাসে-ট্রামে, অফিস-কাছারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবমাননার টিটকিরি। রবীন্দ্রনাথের শহরে বেরছে দেশভাগ করা দাঙ্গাবাজের স্মারক শোভযাত্রা।

কলকাতা বাড়ছে আকাশের দিকে। আর মাটিতে বস্তির দখল নিচ্ছে প্রোমোটার। শহরে ঠাঁই হচ্ছে না গরীব, মধ্যবিত্ত মানুষের। কাঁচা টাকা উড়ছে হাওয়ায়। রাতে ঘুম উড়ছে লকডাউনে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের।

রেড ভলান্টিয়ারদের কাছে মাঝরাতে ফোন আসছে ব্যাঙ্গালোর থাকা সন্তানের। কলকাতায় নিঃসঙ্গ বাবা মায়ের সাহায্যের জন্য। কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে আগামী প্রজন্ম। আর প্রতিদিন ভোরবেলা খেটে খাওয়ার জন্য হাজারে হাজারে মানুষ আসছেন শহরে। ফ্লাইওভারের নাম হচ্ছে 'মা', ফ্লাইওভারের তলায় ঝুপড়ি বানাচ্ছেন সন্তানরা।

শহর ঢাকছে হোর্ডিংয়ে। তাতে লেখা আছে ''একটার সাথে একটা ফ্রি''। 'ফ্রি'—কিন্তু লেখাপড়া, স্বাস্থ্য পরিবহন বাদে শুধু লেখাপড়া করতেই প্রচুর টাকা লাগছে তাই না, লেখাপড়া করানোর জন্য শিক্ষক হতে গেলেও ঘুষ দিতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ। এসএসসি, টেট পরীক্ষা মারফৎ নিয়োগ প্রক্রিয়া আসলে পরিণত হয়েছে তৃণমূল নেতাদের ঘুষ খাওয়ার আখড়ায়। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লেখাপড়া। সব চেয়ে বেশি অবহেলিত হচ্ছে হিন্দী ও উর্দু মাধ্যমে পড়া ছাত্ররা। বন্ধ হচ্ছে কর্পোরেশনের স্কুল। আর খোলা স্কুলছুটের মহামারি।

ভয়ঙ্কর মহামারির মধ্যেও বাঁচার স্বপ্ন দেখছে আমাদের শহর। সুস্থভাবে কলকাতাকে বাঁচতে দিন। রেললাইনের ধারে বড় হয়ে ওঠা বাচ্চাটাকে দিন বর্ণপরিচয়। ঘাম ঝরানো মজুরের জন্য দু'বেলা খাওয়া। মানুষকে দিন সংক্রমণের আতঙ্কহীন উৎসব। চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করা যুবককে দিন কাজের নিশ্চয়তা, ছুটির নিশ্চয়তাও। কাজ থেকে ফেরত আসা যুবতীকে দিন নিশ্চিন্ত রাজপথ, নিশ্চিন্ত গৃহকোণও। কলকাতাকে দিন শুদ্ধ বাতাস, সুস্থ্য জীবন। বাতাসে ছড়িয়ে দিন বদলের ডাক।

জোরে ছুটছে আমাদের শহর। খাদে পড়ার আগে কলকাতার স্টিয়ারিং বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিন।

দিল্লির রাজপথে আর এস পি'র গণবিক্ষোভ অবস্থান

১-এর পাতার পর

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সমস্ত রাজ্যে এমন আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

২৬ নভেম্বর দিল্লির সমাবেশের আরও একটি মুহূর্ত

আর এস পি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. এন কে প্রেমচন্দন এই ঐতিহাসিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয়ে দলে গর্বিত।

কম. এন কে প্রেমচন্দন
বক্তব্য রাখছেন

দেশের কৃষকরা ধারাবাহিকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। গত বছর কৃষি বিল আনার সময়ে লোকসভায় আর এস পি বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। সীমিত সাংগঠনিক ক্ষমতাতেও সংসদের ভেতরে ও বাইরে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে আর এস পি। আমাদের দল ২৬ নভেম্বর কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে দেশ বাঁচানোর ডাক দিয়ে সংসদ অভিযানের কর্মসূচি নেয়। ইতিমধ্যে কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হয়েছে। মোদি স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে ক্ষমা চেয়েছেন। তবে তাঁকে কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এম এস পি'র জন্য আইন করা ও নয়া বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চলবে।

আর এস পি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ বলেন যে, পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই সরকার একের পর এক শ্রমিক বিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। শ্রম আইন তুলে শ্রম বিধি জারি করার বিপদের উল্লেখ করে তিনি শ্রম বিধি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কেরালা রাজ্য সম্পাদক কম. এ এ আজিজ, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কম. শত্রুজিৎ সিং, কম. শিবু জন, কম. প্রমথেশ মুখার্জি, কম. বাবু দিবাকরণ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার পক্ষে কম. সুভাষ নস্কর, সারা ভারত মহিলা সংঘের পক্ষে কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কম. রাজীব ব্যানার্জী, পি এস ইউ'র পক্ষে নওফেল মহ. সফিউল্লাহ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা কৃষি নীতি, কর্মসংস্থান নীতি শিক্ষানীতি, নারী নির্যাতন নিয়ে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, কর্পোরেট দালালি করতেই সরকার এইসব নীতি গ্রহণ করেছে। আর এস পি মনে করে পুঁজিবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন তীব্রতর করেই এই আক্রমণ রুখতে হবে।

এছাড়া দিল্লি রাজ্য কমিটির পক্ষে কম. আর এস ডাগর, পাঞ্জাব রাজ্য কমিটির পক্ষে কম. কার্নাইল সিং ইকোলহা, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষে কম. জানকি রামুলু, মধ্যপ্রদেশের নেতা কম. বুধ সেন রাঠোর, অসমের কম. রবীন মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশস্থল থেকে আগামীদিনে রাজ্যে রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রম বিধি বাতিলের দাবিতে ইতিমধ্যেই দুদিন ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এম এস পি'র দাবিতে আন্দোলন জারি রেখেছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ বিলের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে।

এরই মধ্যে মাত্র কয়েকদিন আগে নাগাল্যান্ডে আধা সামরিক বাহিনীর গুলিতে দেশের নিরীহ নাগরিকরা নিহত হয়েছেন। ইউ এ পি এ, আফস্পা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক আইন তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চলছে। উচ্ছেদ বিরোধী পরিবেশ আন্দোলন পুঁজিবাদী উন্নয়নের মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। করোনা অতিমারির সুযোগে শিক্ষা সংকোচন নীতি ও নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। আর এস পি ও তার মতাদর্শে বিশ্বাসী গণসংগঠনগুলি আগামীদিনে এই লড়াই, আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

২৬ নভেম্বর সারা ভারতের এমন জঙ্গি বিক্ষোভ সমাবেশ স্পষ্ট করেই দলের সমস্ত স্তরে একটি বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে যে আর এস পিও একক উদ্যোগে এমন কর্মসূচি সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে। এমন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে দলের সাধারণ কর্মীরা বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ততা ও তৎপরতার পরিচয় রেখেছেন। ঔদ্ধত্য ছিল না। ছিল দৃঢ় প্রত্যয় এবং দলের নীতি আদর্শের প্রতি গভীর ভালবাসা। আর এস পি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছে যে, সংগ্রামী কর্মসূচি এবং সংগঠনের বিস্তার একই সঙ্গে চলতে পারে। এই উপলব্ধি কাজে লাগিয়ে আরও ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দলের ক্ষুদ্রতা কর্মীদের মনে এক ধরনের বিভ্রান্তি বা হাল ছেড়ে দেবার মনোভাব ইতিমধ্যেই বর্তমান থাকলেও সাহস করে কর্মসূচি গ্রহণ করলে এখনও আর এস পি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

দিল্লির সমাবেশে যোগদান করতে কমরেডদের অনেককেই বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। থাকার জায়গা যথেষ্ট ছিল না। রেলের টিকিট পাওয়ার সমস্যাও ছিল। এসব সত্ত্বেও কমরেডদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

সাহস ও দুঃসাহসের মধ্যে ফারাক সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই এই কঠিন সময় অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে। ঘরে বসে থেকে তা কখনই হতে পারবে না। যদি কেউ মনে করেন যে, এতাবৎকাল পর্যন্ত যেভাবে চলেছেন এখনও সেভাবেই চলবেন তাহলে, দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হবে না। ঝুঁকি নিতেই হবে। চরম

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
আরএসপি'র সাধারণ সম্পাদক
কম. মনোজ ভট্টাচার্য

প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। লাল পতাকার সম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব আর এস পি'র কমরেডদের বহন করতেই হবে।

ডিভিসিতে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

গত ২ ডিসেম্বর থেকে ডিভিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি মাত্র শ্রমিক সংগঠন (আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত) বাদে ইউ টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি ইত্যাদি সহ আটটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব যৌথভাবে ডিভিসি'র সদর দপ্তর ডিভিসি টাওয়ার্সে আমরণ অনশনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছিল। সুদীর্ঘ প্রায় একটি বছর ধরে কোভিড জনিত পরিস্থিতির মধ্যে মাঠে ময়দানে নেমে আন্দোলন না করতে পারলেও যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কখনও এককভাবে, কখনও বা যৌথভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে। কিন্তু প্রতিটি ইউনিয়নই কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইতিপূর্বে গত ৮ সেপ্টেম্বর '২১ থেকে যে লাগাতার অনশনের কর্মসূচি ইউনিয়নসমূহ একত্রে ঘোষণা করেছিল, কর্মসূচি শুরু করার প্রাক্ মুহূর্তেই কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কয়েকটি দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইউনিয়ন সমূহের যৌথ নেতৃত্ব একত্রে সেদিন অনশন ধর্মঘট পিছিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ডিভিসি কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও তাদের পক্ষ থেকে সমস্যাগুলি সমাধানের কোন চেষ্টাই করেনি।

৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ শুধু অনমনীয় মনোভাবই দেখায়নি, ডিভিসি পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকটি শ্রমিক কর্মচারী এবং ডিভিসি উপত্যকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে। যেমন বেরমো কয়লাখনি অন্য সংস্থার কাছে হস্তান্তরকরণ, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রমুখ জনপরিষেবামূলক ডিভিসি'র নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারিকরণ ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে।

আপাতত যে দাবিগুলি সামনে রেখে ইউনিয়নগুলি আন্দোলনে নেমেছে তা মূলত শ্রমিক কর্মচারীদের পদোন্নতি, হেডঅফিস থেকে দূরে অবস্থিত বিভিন্ন শাখার এফ সি এ স্ট্যাগনেশন রিমুভ্যাল ইত্যাদি মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সুযোগসুবিধা সম্পর্কিত। এছাড়া বহুদিন ধরে ডিভিসিতে নতুন পেনশন নীতি প্রত্যাহার করার দাবি উপেক্ষিত হয়ে আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৪ সালে প্যানেলভুক্ত কর্মীরা, যারা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে অনেক পরে চাকরিতে বহাল হয়েছে, তাদেরও পুরানো পেনশনের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথচ সমস্ত ক্ষেত্রে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশনের নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত ধরনের শ্রমিক কর্মচারী যারা ২০০৪ সালের পরে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে।

এই সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে ডিভিসি স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুণ্ডু, মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ডিভিসি'র শ্রমিক কর্মচারীদের প্রবীণ নেতা মনোজ আচার্য, ডিভিসি'র শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জীবন আইচ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ২ ডিসেম্বর দুপুর ১টা থেকে লাগাতার অনশন শুরু করেন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে ডিভিসির বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে টাওয়ার্সে আগত শ্রমিক কর্মচারীরাই শুধু নয় — সারা উপত্যকায় এই আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়ে। নেতৃবৃন্দের এই অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নয়াউদারবাদী আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে একে একে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণের পথ ধরেছে। এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সারা দেশের খেটে খাওয়া মানুষ আন্দোলনের পথ বেছে নিচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীতে কৃষকদের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধাক্কায় কেন্দ্রীয় সরকারকে মানুষমারা তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছে। অশোক ঘোষ বলেন যে, তার দৃঢ় প্রত্যয় ডিভিসি'র মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে এই ধরনের বিলগ্নিকরণের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করতে পারে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন। ২ ডিসেম্বর এই আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ অপরাহ্নে বিকেল সাড়ে তিনটার সময় যৌথ আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না।

পরের দিন ৩ ডিসেম্বর এই আন্দোলনের ঢেউ চন্দ্রপুরা, বোকারো, মেঝিয়া, দুর্গাপুর, মাইথন, পাঞ্চেত, কোডারমা, অন্ডাল সহ সমস্ত সাবস্টেশনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি শাখায় চেয়ারম্যানের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। প্রায় ৫০ ঘণ্টা অনশন ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে অনশনকারীদের মধ্যে তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষ ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পুনরায় আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অবশেষে কর্তৃপক্ষ এই আলোচনায় আন্দোলনরত ইউনিয়ন নেতৃত্বের কাছে অধিকাংশ দাবি পূরণের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষন করে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইউনিয়ন নেতৃত্ব আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে সময় দেয় এবং সাময়িকভাবে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই আন্দোলনে অশীতিপর প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মনোজ আচার্য এবং ডিভিসি স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুণ্ডু প্রথম সারিতে থেকে সারা উপত্যকায় সংগ্রামের আবহ নির্মাণ করেন। তাপস কুণ্ডু এই সংগ্রামী ঐক্যকে ধরে রাখার শপথ রেখে বলেন যে, ''আপাতত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।''

প্রয়োজন লক্ষ্যে অবিচল আপসহীন নেতৃত্ব

অশোক ঘোষ

‘রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে/রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম/অর্থ তার ভোলে...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে/
ওরা কাজ করে।’

সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রায় শতবর্ষ আগে। দেশের কৃষক আন্দোলন ইতিহাসের রুপোলি রেখা হয়ে শাসক শ্রেণিকে শিক্ষা দিয়ে গেল যারা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে তাদের হাতে কাস্তে শাসকের বেয়নেটের চেয়েও ধারালো। ঐক্যবদ্ধ ও লক্ষ্যে অবিচল কৃষক আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যা- গরিষ্ঠতায় মদগর্বী মূঢ়সম আস্ফালন শেষ কথা বলে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো কোনও রাষ্ট্রেই ক্ষমতা নয়, জনসাধারণই শেষ কথা বলে। দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী কোনও শাসক দলের নেতৃত্বই ক্ষমতায় থাকার সময় সহজ কথাটা বুঝে উঠতে পারে না। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যই ক্ষমতার বিনাশ নিশ্চিত করে। যে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতায় বসায় তারাই আবার একসময় ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। রাজনৈতিক উত্থান ও পতনের ইতিহাস অনুধাবন করলে প্রধানমন্ত্রীর অনেক আগেই পরিস্থিতি সচেতন ও মানবিক হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আজ জনতার দরবারে তাকে ক্ষমা চাইতে হত না। ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতন। ইতিহাস বড় নির্মম। ঠিক এক বছর আগে নভেম্বর ২০২০-তে কেন্দ্রের সরকার কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করল দেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে। এমন তিনটি কৃষি আইন সরকার সংসদে আলোচনা ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনুমোদন করিয়ে নিল, যা কার্যত দেশের কৃষি ব্যবস্থার কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। দেশের কৃষক সংগঠন সমূহের সঙ্গেও মত বিনিময় হয়নি। সরকারের রাজনৈতিক সত্তার বিসর্জন ঘটল কর্পোরেটের খাজাঞ্চিখানায় রাষ্ট্রের হাতে থাকা আইন আদালত, বলপ্রয়োগ, শাসক দলের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর হামলা সংবাদ মাধ্যমের প্ররোচনা ইত্যাদির ব্যাপক অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। কার্যত ঠিক এক বছর আগে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করল দেশের কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্ব আলোচনার সব পথই বন্ধ হয়েছে দেখে নভেম্বর ২০২০-তেই সংসদ অভিযানের আহ্বান জানালো। সরকার শুরু করল বল প্রয়োগ ও বিভাজনের রাজনীতি।

কর্পোরেটের প্রতি দায়বদ্ধ মোদি সরকার ঔদ্ধত্য, দম্ভ ও অহংকারের আস্ফালনের কারণেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আলোচনার পথ বর্জন করলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে চলে। সরকার যত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর দেখাতে চেষ্টা করে, ততই মানবিক মুখ বিলীন হয়ে যায়। দেশের মানুষ ভুলে যান নি সেই দৃশ্য, রেললাইনের ওপর পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন রুটির টুকরো, আর মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহ। তারপরেও দেশের মন্ত্রীরা এক মিনিটের জন্য শোকজ্ঞাপন করেননি।

১৯ নভেম্বর ২০২১। আগের বছর নভেম্বর ২০২০ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আর ঠিক এক বছর পরে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছেন নরেন্দ্র মোদি দেশের জনসাধারণের কাছে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা সহ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, ক্ষমতার ঔদ্ধত্যই শাসক দলের সরকারের বিনাশ নিশ্চিত করে। শ্রমজীবী মানুষই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। দাবিতে যুক্তি ছিল, তাই সরকার আইন প্রত্যাহার করেছে।

অবশেষে সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হলো এই আন্দোলন খালিস্তানি, দেশদ্রোহী, উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। দেশের কৃষকরাই তাঁদের স্বার্থেই এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। গত এক বছরে সাতশো কৃষক বন্ধুর জীবনাবসান হয়েছে এই আন্দোলনের ফলে। তাঁদের প্রতি শোকজ্ঞাপন না করেই প্রধানমন্ত্রী কৃষকবন্ধু হতে পারলেন না।

নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থকে ক্রমাগত জয়ের স্বাদ পেতে পেতে পরাজয় কল্পানাও করেননি। এবার তাঁকে পরাজয় প্রত্যক্ষ করতে হলো। সামনেই পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ ৫ রাজ্যের ভোট। কয়েকদিন আগে দেশব্যাপী ৩৬ বিধানসভা, ৪ লোকসভার নির্বাচনে বিজেপির ভোট কমায় সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে। আজ বিজেপির অতি বড় সমর্থক হোক বা সাধারণ মানুষই হোক বাজারে গিয়ে আচ্ছে দিন কেউই খুঁজে পাচ্ছে না। কৃষক আত্মহত্যার মর্মান্তিক সংখ্যায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের মানুষকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর হিসেব অনুসারে ঋণের দায়ে ২০২১ সালে ১০, ৬৭০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেন।

এই কৃষক আন্দোলন থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতা পূর্ণ করবে। কৃষক আন্দোলনের সফলতা যেমন এক নতুন অভিমুখের সৃষ্টি করেছে, তেমনই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে শ্রমিক সংগঠন সমূহ। পথের দিশা ঠিক থাকলে শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন সমস্ত বাধা কাটিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে পারে জনবিরোধী আইন প্রত্যাহারে। এই শিক্ষা থেকেই যে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে অনুমোদন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে বাধ্য করতে হবে আইন প্রত্যাহারে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী জনতার আন্দোলনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের নেতৃত্বে সক্ষম হবে, সরকারকে বাধ্য করবে শ্রম কোড প্রত্যাহারে। নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ও সাহসী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ পথেও এ কাজ করা সম্ভব।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করার পর শাসন ক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা সকলেই অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে কার্যত দেশের প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই তুলে দিতে চেয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে শ্রম আইন সংশোধনেই ছিল সরকারের গুরুত্ব। কেন্দ্রের ও রাজ্যের সব মিলিয়ে ১৪০টি শ্রম আইনের খোলনলচে বদল করে চারটি শ্রমকোডে রূপান্তরিত হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি অর্জন করে, এমনকি সংসদে আলোচনার পথ পরিহার করে শ্রমকোড গৃহীত হয়েছে। শ্রমের বিষয়টি সংবিধানের যৌথ তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গেও কেন্দ্রের সরকার আলোচনা করেনি। গত ছয় বছর ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়নি, যেখানে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা হতে পারত।

গত এক দশক ধরেই দেশের সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করেছে। শ্রমিক সংগঠন সমূহের রাষ্ট্রীয় মঞ্চ দেশব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তুলেছে। সবকার স্বীকৃত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির চিঠিপত্র দেওয়া, আলোচনায় আহ্বান জানানো, ধর্মঘট সংগঠিত করা, সংসদ অভিযান, আইন অমান্য ইত্যাদি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ নিরলসভাবে করে গিয়েছে। দেশে কোনও জাতীয় বেতন নীতি নেই। আর্থিক সমৃদ্ধির সরকারি ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ফেরিওয়ালা, সাধারণ কৃষক, হতভাগ্য কর্মহীন শ্রমিক, অনাহারে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। দেশের ৪০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনাহার, অর্ধাহারের মুখোমুখি। কর্পোরেট পুঁজির হাতে দেশের যাবতীয় সম্পদ তুলে দিয়ে সমগ্র অর্থনীতির বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে সরকার। পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলিও বেসরকারি হাতে সমর্পণ করতে চালু হয়েছে ‘অ্যাসেট মনিটাইজেশন পাইপলাইন।’

ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সামনে সংগ্রামের প্রেরণা। শ্রমিক সংগঠন সমূহের নেতৃত্বকে কলকারখানা সহ দেশের প্রান্তে প্রান্তে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। বেসরকারিকরণের ধাক্কা কত ভয়াবহ তা, সাধারণ শ্রমিকশ্রেণি এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। শ্রমিক সংগঠন সমূহের নেতৃত্বের মধ্যে বোঝাপড়াও যথেষ্ট নয়। ঐক্য গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের।

দেশে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা শ্রমজীবী মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকরা যেভাবে দিল্লিতে এক বছর অবস্থান করতে পারেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সেভাবে হয়তো অবস্থানে শামিল হতে পারবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণির সেই পথে নামার সম্ভাবনা। নিশ্চিত করতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহকে। স্থিতাবস্থার হাত ধরে চলা আন্দোলন আর মানসিকভাবে আপসপন্থী নেতৃত্ব এই কাজ করতে পারবে না।

সরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলন শুধুমাত্র আর্থিক লাভ-লোকসানের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের সম্পত্তি কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধে নামতে হবে। আন্দোলন তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র ফেসবুক ও ট্যুইটার নির্ভর আন্দোলন করে সরকারকে নীতি স্বীকার করানো যায় না, এর জন্য প্রয়োজন মাটিতে নেমে সাধারণ জনতার হাত মিলিয়ে গণ আন্দোলন করা। কারণ, মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্ষমতার কোনও বিকল্প নেই। ইতোমধ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের ও সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্ব সহমত হয়েছেন একসঙ্গে শ্রম কোড প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সাহসী ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল আপসহীন নেতৃত্বই পারবে সরকারকে নীতি বদলে বাধ্য করতে।

২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ১১ নভেম্বর, ২০২১-এ যন্তর মন্তরে শ্রমিকদের একটি জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। কনভেনশনে মোদী সরকারের কর্পোরেটপন্থী, জনবিরোধী, শ্রমিক-বিরোধী এবং কিষাণ-বিরোধী নীতিগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। কনভেনশন সর্বসম্মতিক্রমে সংসদের বাজেট অধিবেশনে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ১২ দফা দাবি-সনদ নিষ্পত্তির দাবিতে দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আলোচনা করে সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ চূড়ান্ত করেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি বিবৃতি জারি করেছে, ঘোষণা করেছে যে ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘট হবে।

দাবির সনদ

(১) শ্রম কোড বাতিল করা। (২) সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ফার্ম আইন বাতিলের পর ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া। (৩) যে কোনো প্রকার বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণ বন্ধ করা। (৪) আয়কর প্রদানকারী নয়, এমন পরিবারকে প্রতি মাসে ৭৫০০ টাকা আয় নিশ্চিত করা ও খাদ্য প্রদান করে সহায়তা করা। (৫) ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং শহর এলাকায় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের সম্প্রসারণ। (৬) সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা। (৭) অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে-মিল এবং অন্যান্য প্রকল্প কর্মীদের জন্য বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। (৮) মহামারীর মধ্যে জনগণের সেবা করা ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা এবং বীমা সুবিধা। (৯) জাতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সম্পদ কর ইত্যাদির মাধ্যমে ধনীদের কর আরোপের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক ইউটিলিটিগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি। (১০) পেট্রোলিয়াম পণ্যের কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ১১) চুক্তি কর্মী, প্রকল্প কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং সবার জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতন। ১২) এনপিএস বাতিল এবং পুরাতন পেনশন পুনরুদ্ধার, কর্মচারীদের পেনশন প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম পেনশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

নতুম উদ্যমে গণবার্তার যাত্রাপথ উজ্জ্বল হোক

গত ২০ নভেম্বর প্রতি বছরের মতো এবারও ক্রান্তি প্রেসে অবস্থিত লোকায়ত সভাগৃহে শারদীয় গণবার্তায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে লেখক এবং পাঠক-পাঠিকাদের সভা আহ্বান করা হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে, করোনাজনিত স্বাভাবিক মেলামেশার অতি সীমাবদ্ধ সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতার আবহ থাকার জন্য প্রতি বছরের তুলনায় লেখক এবং পাঠকের উপস্থিতি যথেষ্ট কম ছিল।

প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে শারদীয় গণবার্তার এই বার্ষিক সভা সংগঠিত হলেও উপস্থিত লেখক- পাঠকদের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নত মাত্রায় উপনীত হয়েছিল। সভা পরিচালনার দায়িত্ব পার্থসারথি দাশগুপ্তের উপর অর্পিত হওয়ার পর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে শারদীয় গণবার্তা গত বছরের তুলনায় যে ধরনের সামগ্রিক সংকট সামান্য হলেও কাটিয়ে উঠে আবার পত্রিকার ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে পেরেছে এবং লেখক ও পাঠকদের সহযোগিতা পেয়েছেন তার জন্য তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সভার প্রথম বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং গণবার্তার শুভাকাঙ্ক্ষী ও নিয়মিত লেখক ড. তুষার চক্রবর্তী। তিনি প্রথমেই গণবার্তা যে দীর্ঘ সাতটি দশক ধরে বাংলার প্রখ্যাত এবং অনন্য সাম্যবাদী ধারার লেখকদের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং সহযোগিতায় বাম ধারার পত্র- পত্রিকায় নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছিল সেই ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়, ত্রিদিব চৌধুরী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা প্রিয়তোষ মৈত্রেয়র মতো প্রখ্যাত বিদ্বজ্জনই শুধু নন, বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের মূল্যবান লেখায় গণবার্তা এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছিল। এছাড়া শারদীয় গণবার্তার সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত অমিয়ভূষণ মজুমদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহ প্রখ্যাত গল্প লেখকের অবদান গণবার্তা পত্রিকাকে বিদগ্ধ মহলে আকর্ষণীয় করেছিল। শ্রীচক্রবর্তী এবারের শারদীয় পত্রিকায় মনোজ ভট্টাচার্য, দিলীপ গোস্বামী, রতন খাসনবীশ প্রমুখের মূল্যবান আলোচনা উল্লেখ করেন। এবারের শারদীয় গণবার্তার প্রতিটি গল্প যথেষ্ট উন্নতমানের হয়েছে বলেই উল্লেখ করেন তুষার চক্রবর্তী। তুষার চক্রবর্তীর আলোচনার সূত্র ধরেই শারদীয় গণবার্তার লেখক অশোক ঘোষ গণবার্তার রাজনৈতিক তথা অনন্য সাংস্কৃতিক ঘরানার কথা তুলে ধরেন। সাপ্তাহিক গণবার্তা কিভাবে আরও অনেক বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সহজবোধ্য ভাষায় দৈনন্দিন সমস্যা ও শ্রেণিশোষণের ঘটনাগুলি তুলে ধরে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করে সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন।

এছাড়া কবি অমল কর তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে ব্যাখ্যা করে বলেন বর্তমানে চারিদিকে বিজ্ঞাপন এবং বাজারি প্রচার মাধ্যমের আধিপত্যের যুগে গণবার্তার মতো বামপন্থী পত্রিকার সংগঠন পরিচালনা করা এবং নিয়মিত প্রকাশ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বিষয়। এবার গত বছরের সমস্যা কাটিয়ে উঠে অনেক সম্ভাবনাময় নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশ করে যেভাবে গণবার্তা তার মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে তার জন্য অবশ্যই গণবার্তার সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিতে হয় বলে মনে করেন শ্রী অমল কর।

এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য, সনৎ ঘোষ, নওফল মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রমুখ গণবার্তার লেখক। প্রত্যেক বক্তাই কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এবছর শারদীয় গণবার্তা প্রকাশ করতে হয়েছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এরা প্রত্যেকেই সম্পাদকমণ্ডলী যেভাবে প্রবীণ বিদগ্ধ লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের উৎসাহ দিচ্ছেন সেই প্রশংসনীয় উদ্যোগ-এর জন্য জন্য ধন্যবাদ জানান। সাপ্তাহিক গণবার্তা নিয়মিত প্রকাশ করা এবং পাঠকসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রত্যেকেই সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

লেখক ও পাঠকদের এই সভার শেষ বক্তা পত্রিকার সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যাঁরা এই সভায় এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। তিনি তুষার চক্রবর্তী এবং অশোক ঘোষের বক্তব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী প্রচন্ড আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও শারদীয় গণবার্তা পত্রিকার প্রবন্ধ এবং সাহিত্য বিভাগের উন্নতমান ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে পুনরাবৃত্তি মনে হলেও এটাই বাস্তব যে বিজ্ঞাপনের অভাব এবং এবং চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গণবার্তাকে নিয়মিত প্রকাশ করা এবং শারদীয় গণবার্তার মতো পত্রিকা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি পত্রিকার পাঠকদেরও বিশেষ উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, গণবার্তা পত্রিকা অন্যান্য বামপন্থী পত্রিকার পাশাপাশি পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চাশের দশকের দৈনিক গণবার্তার সাংবাদিক ও বার্তা সম্পাদক পরবর্তীকালে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও মার্কসীয় তত্ত্ববিদ ড. অরবিন্দ পোদ্দারের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন এবারের অরবিন্দ পোদ্দার সম্পর্কিত ক্রোড়পত্র সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সত্যিই সার্থক বলে স্বীকৃত হয়েছে।

মনোজ ভট্টাচার্যের ভাষণ ও শ্রোতাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কমরেড অবনী রায়ের জীবনাবসান

গত ২৫ নভেম্বর সকাল প্রায় দশটা নাগাদ দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে কমরেড অবনী রায়ের দেহাবসান ঘটে। ২৪ নভেম্বর সকালে তিনি হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ বোধ করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে পৌঁছেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর। অকৃতদার এই মানুষটি দলের তত্ত্বাবধানেই বর্তমান সাংসদ কমরেড এন কে প্রেমচন্দনের বাসস্থানেই থাকতেন।

২০১৬ সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তারপর থেকেই সক্রিয়তা আর থাকে নি। চলাফেরা করতে পারতেন না। দলের কাজে যুক্ত থাকতেও পারতেন না। শুধুমাত্র সেবা যত্নের জন্যই তিনি এতকাল জীবিত থাকতে পেরেছিলেন। দলের দৈনন্দিন কাজকর্মে সেভাবে যুক্ত থাকতে না পারলেও তিনি নানা প্রসঙ্গে মতামত দেবার চেষ্টা করতেন।

দীর্ঘ বহুবছর সর্বভারতীয় স্তরে দল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। দলের প্রতিনিধি হিসেবে বামপন্থীদের বহু কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত থাকতেন। সে কারণেই রাজধানীর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ও সদ্ভাব গড়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর তিনি রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে তিনি সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সংগঠনের কাজে বহু রাজ্যে তিনি গেছেন এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

অবনী রায়ের আদি বাড়ি বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর অঞ্চলে। অত্যন্ত অল্প বয়সেই তাঁর পিতা চাকুরিসূত্রে দিল্লি চলে যান এবং অবনী রায়ের বিদ্যালয় শিক্ষা দিল্লি শহরেই সমাপ্ত হয়। ১৯৫৯ সালে তিনি কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন ছাত্রনেতা কমরেড প্রণব মুখার্জীর সংযোগ। ক্রমে তিনি পি এস ইউ-এর সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রথমদিকে তিনি পি এস ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় টালিগঞ্জ অঞ্চলে দলীয় সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর তিনি আর এস পি নেতা কমরেড প্রণব মুখার্জীর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টালিগঞ্জ অঞ্চলে বহুসংখ্যক মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসবে তিনি দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও জননেতা কম. ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে সহায়তা করার জন্য আশির দশকের মাঝামাঝি দিল্লি চলে যান। সেই সময়কাল থেকেই তিনি দিল্লির স্থায়ী বাসিন্দা এবং আর এস পি কর্মী। তাঁর অমায়িক এবং আন্তরিক ব্যবহারের জন্য তিনি দিল্লির বামপন্থী মহলে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং দলের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি অনায়াসেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

কমরেড অবনী রায়ের মৃত্যু অবশ্যই আর এস পি'র সর্বভারতীয় সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিশেষ শূন্যতার সৃষ্টি করল। তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানার পরেই দিল্লির বাম রাজনৈতিক পরিসরেও বিশেষ শোকের ছায়া নেমে আসে।

কম. রায়ের মরদেহ ৪০, ক্যানিং লেনে বিকেল সাড়ে চারটা থেকে শায়িত থাকে। নেতার প্রতি প্রথমেই শেষ শ্রদ্ধা জানান আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য। মাল্যদান করেন দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সাংসদ কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, কম. অশোক ঘোষ, কম. শিবু জন, কম. বাবু দিবাকরণ, কম. এ এ আজিজ, কম. প্রমথেশ মুখার্জী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। ঘটনাচক্রে ২৬ নভেম্বর দিল্লির বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে দলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কমরেড ২৫ নভেম্বরই দিল্লি পৌঁছে গেছিলেন।

কম. অবনী রায়-এর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে উপস্থিত হন, সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কম. ডি রাজা, শ্রমিক নেত্রী কম. অমরজিৎ কাউর, সি পি আই (এম)-এর নেতা কম. প্রকাশ কারাত, শ্রমিক নেতা কম. তপন সেন, সি পি আই এম এল-এর সাধারণ সম্পাদক কম. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, কম. সন্তোষ রায়, কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন, শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধির পক্ষে মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে পুষ্প স্তবক পাঠানো হয়। এছাড়াও বহু সংখ্যক বাম কর্মী, সাংবাদিক দলে দলে এসে কম. রায়-এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।

সন্ধে ছ'টা নাগাদ মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় লোদি রোড শ্মশান ঘাটে। শেষ সময়ে কম. রায়-এর বেশ কয়েকজন আত্মীয়, তাঁর দুই ভাই এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দলের পক্ষে কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কম. প্রেমচন্দ্রন, কম. অশোক ঘোষ, কম. রাজীব ব্যানার্জী প্রমুখ শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে কম. অবনী রায় চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

কম. অবনী রায় লাল সেলাম।

কম. অবনী রায় অমর রহে।।

কমরেড অবনী রায়-এর স্মরণসভা

গত ২৮ নভেম্বর দুপুর ২টায় ৪০ ক্যানিং লেনে ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রয়াত কম. অবনী রায়-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণসভা পরিচালনা করেন কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন। সভায় শোকবার্তা পাঠ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত কমরেডের সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ও নেতা হিসেবে কম. অবনী রায়ের গভীর সংস্রব ঘটে আর এস পি'র নীতি আদর্শের সঙ্গে। তিনি ছাত্রজীবনের উপলব্ধি সমগ্র জীবনব্যাপী বহন করেন। দলের সর্বভারতীয় সংগঠনের অন্যতম নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যু পরিণত বয়সে হলেও বিশেষ শোকবহ। দল রাজধানী শহরে কম. রায়-এর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। কম. অবনী রায় দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকলেও দলের প্রয়োজনে তাঁর পরামর্শ সর্বদাই পাওয়া গেছে।

কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন যে, কম. রায় কেরল রাজ্যের কমরেডদের কাছেও বিশেষ প্রিয় ছিলেন। দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কম. ত্রিদিব চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য কম. রায় বেশ কয়েক মাস কেরলে ছিলেন এবং সহজভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কম. ডি রাজা, সিটুর সাধারণ সম্পাদক কম. তপন সেন, এ আই টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অমরজিৎ কাউর, এ আই সি সি টি ইউ'র পক্ষে কম. সন্তোষ রায়, ডি এম কে নেতা কে শিবা প্রমুখ।

সভায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্মৃতিচারণা করেন আর এস পি নেতা কম. অশোক ঘোষ। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম. রায়-এর ভূমিকা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতাই সংগঠনের মূলমন্ত্র—কেন্দ্রীয় কমিটি

২৬ নভেম্বর '২১ আর এস পি'র একক আহ্বানে দেশের রাজধানীর রাজপথে ঐতিহাসিক বিক্ষোভ সমাবেশ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর সেই দিনই সন্ধেবেলা দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, কম. এ এ আজিজ, কম. শিবু জন, কম. অশোক ঘোষ, কম. প্রমথেশ মুখার্জী এবং কম. মনোজ ভট্টাচার্য। সভায় ১০ নভেম্বর সাধারণ সম্পাদক যে আলোচ্যসূচি জানিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় ২৬ নভেম্বর সংগঠিত বিক্ষোভ সমাবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পরের দিন অর্থাৎ, ২৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পেশ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় প্রায় সমস্ত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, কম. তপন হোড় ও কম. প্রকাশবাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। সভার প্রারম্ভেই প্রয়াত কম. অবনী রায় এবং কম. পরিতোষ চন্দ'র সংগ্রামী স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় উপস্থিত প্রায় সমস্ত সদস্যই মনে করেন যে, বর্তমান সময়ে দেশের শাসক দল অর্থাৎ, আর এস এস-এর মতো একটি আদ্যন্ত ফ্যাসিবাদী উগ্র হিন্দুত্বনির্ভর সাম্প্রদায়িক শক্তির নেতৃত্বে নিবিড় ভাবে পরিচালিত বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী দল হিসেবে নিছক অস্তিত্ব বজায় রেখে বামপন্থী ভাবাদর্শ ভিত্তিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে নতুনভাবে ভাবতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসৃত শিক্ষাগুলির আরও ব্যাপক প্রচার ও সেগুলি আত্মস্থ করে দল পরিচালনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে হবে। যেমন তেমনভাবে দলের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে যুক্ত থাকলে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব হবে না। দলের সমস্ত স্তরের নেতা ও কর্মীদের এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে স্মরণে রাখতেই হবে।

এই প্রসঙ্গেই ২৬ নভেম্বর এর কর্মসূচির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন নি। এইসব সদস্যবৃন্দ কোনওভাবেই তাঁদের অনুপস্থিতির কারণও জানাননি। আর এস পি'র একনিষ্ঠ কর্মীদের কাছে এমন আচরণ আশা করা যায় না। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এইসব নেতাদের কারণ দর্শানোর জন্য পত্র দেওয়া হবে।

২৬ নভেম্বর এর কর্মসূচির পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লি থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন তা, অবশ্যই পূরণ করেছেন। পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আশানুরূপ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। মহারাষ্ট্রে দলের প্রভাব বিস্তারে যে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেও তিনজন প্রতিনিধি কর্মসূচিতে সামিল হন। অসম থেকে মাত্র দু'জন আসতে পেরেছিলেন। ওই রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করার বাস্তব অসুবিধাগুলি কম. রবিন মণ্ডল ব্যাখ্যা করেন। ত্রিপুরা থেকে মুখ্যত পৌরসভা নির্বাচনে ব্যস্ত থাকার দরুণ কেউই আসতে পারেন নি। তামিলনাড়ুর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক।

২৬ নভেম্বরের বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচিকে বিশেষভাবে সফল বলে কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে। এই সমাবেশে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন। সমাবেশের উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন কম. বাবু দিবাকরণ, কম. এ এ আজিজ, কম. শিবু জন, কম. অশোক ঘোষ, কম. সুভাষ নস্কর, কম. শত্রুজিৎ সিং, কম. আর এস ডাগর, কম. বি এস রাঠোর, কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কম. নওফল মহঃ সফিউল্লাহ, কম. রাজীব ব্যানার্জী, কম. কার্নাইল সিং, কম. রঞ্জিত ভার্মা, কম. জানকী রামুলু, কম. রবীন মণ্ডল প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ২৬ নভেম্বরের কর্মসূচি পালন করতে দলের দিল্লি রাজ্য কমিটির এবং অন্যান্যদের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসিত হয়। সভার মতে ঝুঁকি নিয়ে হলেও এই ধরনের সংগ্রামী কর্মসূচি সমস্ত রাজ্যে প্রতিপালনের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রীয় স্তরেও আরও কর্মসূচি গ্রহণের প্রচেষ্টা নিতে হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত হয়।

আগামী ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ দলের ২৩ তম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কেরল রাজ্যের কোল্লাম কিংবা থিরুভানন্ত পুরমে এই সম্মেলন সংগঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবকটি রাজ্যের সম্মেলন ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও সম্মেলনের সংবাদ দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

দলের সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, পরিচিত পত্র প্রভৃতি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করতে হবে। অগামী জুলাই '২২-এর মধ্যেই সংগঠনের বিস্তারিত রিপোর্ট এবং দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে বিরবণ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে সমস্ত রাজ্য কমিটিগুলিকে যথেষ্ট যত্নশীল হতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দলের বর্তমান সংবিধানের কতকগুলি ধারা সংশোধন এবং নতুন কিছু ধারা সংযোজন করার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সম্পর্কিত পরামর্শগুলি পাঠাতে হব। কম. বাবু দিবাকরণ এবং কম. পার্থসারথি দাশগুপ্তকে এই কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই সংবিধান সম্পর্কিত পরামর্শ ইত্যাদি জানাতে হবে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে।

দলের সদস্য পদের আবেদনপত্র এবং সদস্যপদ পুনঃনবীকরণ ফর্মে বেশ কিছু পরিবর্তন অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন আঙ্গিকের ফর্মগুলি সমস্ত রাজ্য কমিটিকে পাঠানো হবে। নতুন সদস্যপদের আবেদনকারীদের ৫০ টাকা এবং পুনঃনবীকরণে ২৫ টাকা ফি দিতে হবে। নতুন ফর্ম ইংরেজি থেকে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে নিতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারী বা পুনঃনবীকরণকারীকে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি দিতে হবে। আবেদন পত্রে আধার/ভোটার কার্ড নম্বর উল্লেখ করতে হবে। ফোন/মোবাইল নং এবং সম্ভব মতো ই-মেইল আই ডি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। সমস্ত আবেদনপত্রগুলি ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষভাবে মনে করে যে, গণসংগঠনগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে দলকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। পি এস ইউ, আর ওয়াই এফ এবং সংযুক্ত কিসান সভার সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা প্রয়োজন। সেই হিসেবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি '২২ দিল্লিতে পি এস ইউ ও কিসান সভার কনভেনশন সংগঠিত করা হবে। ঐদিন সকাল ১০টা থেকে পি এস ইউ এবং বেলা ৩টা থেকে কিসান সভার সাংগঠনিক সভা। পি এস ইউ'র পক্ষে কম. নওফল মহ সফিউল্লাহ এবং কম. কম. ফেবি স্তালিন আহ্বায়কের ভূমিকায় থাকবেন। সংযুক্ত কিসান সভার সভা আয়োজনের মূল দায়িত্ব কম. সুভাষ নস্কর বহন করবেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি আর ওয়াই এফ-এর জাতীয় কমিটির সভা। সমস্ত রাজ্য কমিটিগুলিকে এ প্রসঙ্গে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায় আহ্বান করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সম্মেলনে পেশ করার জন্য খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদন বা থিসিস প্রস্তুত করার জন্য কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন ও কম. অশোক ঘোষ দায়িত্বে থাকবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির ফান্ড : কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রত্যেক বছর এক লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জমা দেবে এবং অন্যান্য রাজ্য কমিটি দশ হাজার টাকা করে জমা দেবে। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের সংগঠন সম্পর্কে সভায় রিপোর্ট করা হয়। অসম, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যগুলিতে সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষভাবে অনুভব করে যে সঠিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ সাংগঠনিক উদ্যোগ না থাকলে কোনো কাজে আসে না। সেই হিসেবে দলের সর্বস্তরে বিশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে হবে।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের চাকরির দাবিতে মালদায় আন্দোলন

গত ২ ডিসেম্বর মালদার জেলাশাসকের কাছে রাজ্য সরকার, মায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌখিক প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে পরিবারের অন্তত একজনের সরকারি চাকরির দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করতে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদশের ভাদোহিতে দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের বিধবা স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজন। একই দাবিতে তাঁরা মানিকচকে সিডিপিও অফিসে অবস্থান এবং ঘেরাও করেন। এদিনের ঘেরাও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের জেলা সম্পাদিকা কম. তৃপ্তি পান্ডে এবং আর এস পি'র জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য গণসংগঠনের কর্মীবৃন্দ। কোনো দলীয় ঝান্ডা না নিয়ে এই আন্দোলন সংগঠিত হলেও, শাসকদলের পক্ষ থেকে জেলা আর এসপি নেতৃত্বকে জেলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্ররোচিত করার অভিযোগ উঠছে শাসকদলের পক্ষ থেকে।

আর এস পি'র জেলা সম্পাদক কম. সর্বানন্দ পান্ডের বক্তব্য, কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, শুধুমাত্র মৃত সৈনিকদের পরিবারের বিধবা ও অন্যান্যরা যাতে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি পান, তাই তাঁরা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কম. পান্ডের অভিযোগ, মানিকচকের সি ডি পি ও অফিস ঘেরাও-এর কর্মসূচির খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মৃত শ্রমিকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের আন্দোলন থেকে সরে আসতে হুমকি দিচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শাসানিও দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মৃত শ্রমিকদের মাত্র পাঁচজন বিধবা। ছিলেন সাবিনা খাতুন, ফারজানা বিবি, সুলতানা বিবি, সিতারা বেগম ও রহিমা বিবি।

২০১৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী উত্তরপ্রদেশের ভাদোহিতে কার্পেট কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হয় মানিকচকে ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। দুর্ঘটনার পরদিনই মানিকচকের এনায়েতপুরে ছুটে এসে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মৃত শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন ও যোগ্যতা অনুযায়ী পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন। প্রায় তিন বছর পার হয়ে যাবার পরও সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য মহিলারা আন্দোলনের পথে নামেন।

দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিক মোসাহার মোমিনের স্ত্রী সাবিনা খাতুন বলেন, তিন বছর ধরে সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও চাকরি পান নি কেউ। অতিকষ্টে বিড়ি বেঁধে সংসার চালাতে গিয়ে অর্ধাহার অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন সবাই। আর একজন মহিলা বলেন, তাঁরা বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। প্রয়োজনে রাস্তা অবরোধ করবেন।

নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের জেলা সম্পাদিকা কম. তৃপ্তি পান্ডে মিছিলে উপস্থিত থেকে বলেন, ''এদের স্বামীরা ভিনদেশে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সেই সময় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমই শুধু নয়, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, জেলাশাসক, পুলিস সুপার প্রত্যেকেই চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আজ তিন বছর পর এদের কেউ খোঁজখবরও নেন না। এই প্রতিশ্রুতি যাতে সরকার পূরণ করেন, তাই এই মিছিল, ঘেরাও ও দাবিসনদ পেশ করা হচ্ছে।''

মহিলাদের এই আন্দোলনের ধাক্কায় যে সরকার এবং স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বের টনক নড়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের প্রাক্‌মুহূর্তে আবার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তড়িঘড়ি দেখা করার উদ্যোগ সন্দেহ জাগাচ্ছে। আবার নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়গুলি জানাবার প্রতিশ্রুতি দেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

শাসকদলের এই আশ্বাসের প্রসঙ্গে আর এস পি'র জেলা সম্পাদকের বক্তব্য, ''তিন বছর পরেও বিধবারা চাকরি পান নি। সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই এই অপপ্রয়াস। জেলাশাসক মিছিলের নেতৃত্বকে জানিয়েছেন যে সরকারি নির্দেশ না পেলে, তাঁরা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তবুও মানিকচকের সিডিপিও কেন তাদের আই সি ডি এসের দপ্তরে চাকরি হবে বলে দরখাস্ত জমা নিয়েছিলেন? উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি যে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন তার মেমো নম্বর কোথায়? সেটা নিতেই তো তারা এসেছেন।''

মিছিলে উপস্থিত মহিলাদের অনমনীয় মনোভাব এবং স্থানীয় বঞ্চিত মহিলাদের পাশে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে।

Vol. 68 Issue No. 39 শনিবার ৪ ডিসেম্বর, ১১ ডিসেম্বর ২০২১ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপন্ন কৃষিব্যবস্থা

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

দক্ষিণবঙ্গে অসময়ের বৃষ্টিতে আবার ক্ষতির মুখে ক্ষেতের ফসল। ঘূর্ণিঝড় না হলেও, প্রবল বর্ষণে ক্ষেতে জল জমেছে। কোথাও ক্ষতি হয়েছে ধান, আনাজ, ডাল, সর্ষে, পেঁয়াজ। কোথাও আবার সবে বসানো আলু নষ্ট হয়ে গেছে। রীতি মেনেই ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সরকার চাইবে ক্ষতি কম করে দেখাতে আর কৃষকের অভিজ্ঞতা বলবে অন্য কথা। সরকারের দাবি কৃষকদের সহায়তায় নানা প্রকল্প রয়েছে, রয়েছে শস্যবীমা, রয়েছে নানা উপকরণ দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃত কৃষকের মধ্যে ক'জন সেসব সুযোগ পান?

কেন্দ্র-রাজ্য তরজায় মনে হবে, তাদের মধ্যে কৃষক সেবার প্রতিযোগিতা চলেছে। সরকারি প্রচারের শেষ নেই। বাজারে কৃষক আত্মহত্যারও শেষ নেই। এই বাস্তবতাকে বুঝতে না পারলে আমাদের জন্য এক ভয়াবহ বাস্তবতা অপেক্ষা করছে। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য তারই আভাস দিচ্ছে। এবারের প্রবল বর্ষণে শীতের আনাজ নষ্ট হল তাই নয়। ধান, আলুর ফলনে ব্যাপক ঘাটতি হলে, অদূর ভবিষ্যতে পরিণাম ভয়ঙ্কর। নাগরিক জীবনেও সেই ছোঁয়াচ লাগতে বাধ্য। কথায় আছে, আশায় বাঁচে চাষা। এক মরশুমে লোকসান হলে পরের মরশুমে লাভের আশা। এক ফসলে লোকসান, অন্য ফসলে পুষিয়ে নেওয়ার আশাতেই তাঁরা বাঁচেন, তাঁদের বাঁচতে হয়। কিন্তু লোকসানের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি না পেলে? মিডিয়া জানাচ্ছে আলু ক্ষেতে বৃষ্টির জমা জল সরানো নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার পর স্বামী কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ধার করে আলু বসিয়ে বৃষ্টিতে ক্ষতিই তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। হলফ করে বলা যায় যে, দেনার দায়ে কৃষক আত্মহত্যার সত্যতা সরকার স্বীকার করবে না। বলবে সাংসারিক অশান্তিতে মৃত্যু। দিন কয়েক আগেই আরেকজন কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেন। মিডিয়া জানাচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। কৃষকদের জন্য সরকারের এত বন্দোবস্ত থাকলে এমন হচ্ছে কেন? ফসল ফলিয়ে লোকসানটাই যেন এখন দস্তুর। গত বছর থেকে লকডাউনে ফসলের দাম মেলে নি। বীজ, সারের কালোবাজারিতে বেড়েছে খরচ। তারই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আর ঘন ঘন নিম্নচাপের আক্রমণ।

গত বছর এই সময়ে আলুবীজের দাম বস্তায় ৫০০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল (৫০ কেজিতে একবস্তা)। এই বছরের শুরুতে সেই আলু ব্যাপক লোকসানে কৃষক বেচতে বাধ্য হন। সরকার অনেক পরে এম এস পি ঘোষণা করে। কিন্তু সেটা চাষের খরচের থেকে অনেকটাই কম। তাও সরকার নয়, সেই দামে কোল্ড স্টোরেজগুলো নেবে। সরকার এভাবেই ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কৃষকদের লোকসানে বাধ্য করে। অথচ, সরকারি প্রচারে মনে হবে, তারা কতই না কৃষক দরদী। আলু তোলার পর ছিল অন্য ফসলের চাষ। অসময়ের বৃষ্টিতে সেসব ফসলেরও অনেকখানি ক্ষতি হয়েছে।

তারপর ধান রোয়ার সময়ে আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়। নিম্ন দামোদর উপত্যকায় এক মাসের মধ্যে দুবার বন্যা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও আবার এবছরে তিন বার বন্যা হয়ে গেছে। আলু চাষের ক্ষতি ধান চাষে পুষিয়ে নেওয়ার আশা শেষ। অনেককেই বন্যার জন্য দ্বিতীয়বার ধান রুইতে হয়েছিল। তাই এখনও অনেকেরই ধান কাটা হয়ে ওঠে নি। আবার কাটা হলেও অনেকের ধান মাঠেই পড়েছিল। এবারের নিম্নচাপে সেই ধান নষ্ট হল। প্রকৃতির মার একেই বলে।

ধান যারা তুলতে পেরেছিলেন, তাঁরাও কি লাভের মুখ দেখেছেন? এবছরে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এম এস পি) বেড়ে হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা। সরকার কৃষকদের থেকে ধান কেনার বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক কৃষককেই তার থেকেও কম দামে ধান বিক্রি করতে হয়েছে। অনেকেই কুইন্টাল প্রতি ১৫০০ টাকারও কম দরে ধান বিক্রিতে বাধ্য হয়েছেন। অঞ্চল বিশেষে দামের ফারাক থাকলেও, এম এস পি'র থেকে কম দামে বিক্রির চিত্রটা সর্বত্র প্রায় এক। সরকার যদি সরাসরি ধান কেনার সুবন্দোবস্তই করে, তাহলে কম দামে কৃষকদের ধান বেচতে হয় কেন? আসলে গলদটা বিসমিল্লায়।

ধান কেনার কেন্দ্র দূরে হলে ফসল নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। কুইন্টালপিছু ধান বাদ যায়। টোকেন পেতেও নানা হুজ্জত। কিছু লোক বস্তা বস্তা ধান সরকারি কেন্দ্রে বিক্রি করতে নিয়ে যায়, অনেককেই অপেক্ষা করতে হয়। এসব কিছু নিয়ে সক্রিয় থাকে ফড়ে ও দালালদের চক্র। সরকারের কাছে ধান বেচতে রয়েছে নিয়মের হাজার একটা জটিলতা। ছোট চাষি বা ভাগ চাষির এত হুজ্জত পোহানোর সুযোগ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগদ পয়সা হাতে পেতে হবে। কারণ পরের ফসল ফলাতে হবে। তাই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

এবার শীতের আনাজ বা আলু চাষের পালা। আশা ছিল আগের লোকসান এবার পুষিয়ে যাবে। তাতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদ। ধান ঠিক সময়ে তুলে যারা আলু বসিয়েছিলেন, তাঁদের খরচও কম হয় নি। বেশিরভাগ জমিতেই আলু বসানো হয়ে গেছে। আলুবীজের দাম গত বছরের থেকে এবছর কম। আলুর রকম ও এলাকাভেদে মোটের ওপর, বস্তাপিছু ২০০০-৩০০০ টাকা। কিন্তু সার নিয়ে কালোবাজারি হয়েছে। সরকারের থেকে সবাই যদি ঠিকমতো এসব পেতেন, তাহলে কালোবাজারি হল কেন? অনেক পরে সরকারের টনক নড়ল। কিছু অভিযানও হল। কৃষকদের কতটা উপকার হল? বিঘে প্রতি আলু লাগানোর খরচ লেগেছে ১৫০০০-২০০০০ টাকা। কোথাও তারও বেশি। বৃষ্টির জলে সেসবই নষ্ট। কোথাও ক্ষেতে প্রায় এক হাঁটু জল। নতুন করে আবার আলু বসাতে বিঘে প্রতি ১০০০০-১৫০০০ টাকা বাড়তি লাগবে। তবে বৃষ্টির পরের দিন থেকেই বীজের দাম চড়তে শুরু করেছে। কালোবাজারি হলে খরচ আরও বাড়বে। বীজের গুণমান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। যারা পাঁচ-ছয় বিঘা বা তার বেশি জমিতে আলু বসিয়েছিলেন, তাঁদের লোকসানের বহর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

নতুন করে আবার কবে বসানো যাবে, জল সরে কবে জমি চাষযোগ্য হবে তাও অনিশ্চিত। ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় চাষের সময়পঞ্জিকেই বদলে দিচ্ছে। একটা ফসলের দেরি হলে, পরের ফসলেরও হবে। তখন আবহাওয়াও সেই ফসল চাষের উপযুক্ত থাকবে না। আর সবজি চাষে তো সেই সুযোগই নেই। যা নষ্ট হল, তা গেলো।

অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো এবারেও ক্ষতিপূরণের দাবি উঠছে। হয়ত সরকার তা দেবেও। কিন্তু পাবেন কারা? সেখানেও এন আর সি'র মতো সবই কাগজের খেলা। জমির কাগজ চাই। চাষ করুক বা না করুক, ঐ কাগজটাই সব। এই যে কৃষকবন্ধু থেকে শুরু করে এত প্রকল্প। ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুরের বিশেষ উপকারে লাগে না।

জমির মালিকানার কাগজ থাকলে, চাষ না করলেও, সব সরকারি সুযোগ মেলে। তাই ক্ষতিপূরণ বা ঋণ মকুবে অনেকেরই পৌষমাস। সরকারি নিয়মে কৃষকের অর্থ আসলে আলাদা। জমির মালিক চাষ না করলেও কৃষক। পাট্টা থাকলে কিছু সুবিধে তবুও মেলে। সেসব না থাকলে চাষ করলেও সরকারের কাছে কৃষক নয়। কারণ ভাগচাষে মালিকের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক বোঝাপড়া হয়। প্রামাণ্য নথি থাকে না। ভাগচাষি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। আবার পরচা বা পাট্টা পেতেও রয়েছে সরকারি দপ্তরের হেনস্থা। সেখানেও দালালচক্র। দুর্যোগ যত বাড়ে, তত একদলের আয় বাড়ে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায় ব্যাঙ্কে নানা স্কিম রয়েছে। তারই সঙ্গে স্কিম করে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন কৃষকদের বঞ্চিত করার আয়োজনটাও পাকাপোক্ত। সেই সুযোগে ব্যবসা বাড়াচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলি। আধুনিক আইনসম্মত মহাজন। কৃষি অর্থনীতির সঙ্কটে গ্রামীণ অর্থনীতির মন্দা যত বাড়ে, তত তাদের ব্যবসা বাড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ফসলের কম দাম, কালোবাজারি, মাইক্রোফিন্যান্সের কারবার সব মিলিয়ে যেন এক দুষ্টচক্র। আর সঙ্কট বাড়লেই ত্রাতা হয়ে আসরে নামে কর্পোরেট দানবেরা।

কিন্তু এই দুর্যোগ যদি স্বাভাবিক হয়ে যায়? 'নিউ নর্মালসির' যুগে অস্বাভাবিকতাকেই আমাদের স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। ঘন ঘন নিম্নচাপ আর ঘূর্ণিঝড় হতে চলেছে আমাদের নিত্যসঙ্গী। পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হবে তার আঁচ আমরা পাচ্ছি। খাদ্যের দাম বাড়ছে। সেই সুযোগে মুনাফা লুটছে একদল ব্যবসায়ী। এমনিতেই কৃষিকাজ ছেড়ে গ্রাম বাংলার যুব প্রজন্মের বড় অংশ পেটের জ্বালায় চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে। কৃষিজমির চরিত্র বদলাচ্ছে। এরপর এমন চলতে থাকলে খাদ্যসঙ্কট অবধারিত। তাই চাই সার্বিক পরিকল্পনা। ভাগচাষি, ক্ষেতমজুরদের জন্যও সহায়তা। সরকারি প্রকল্পগুলোর সুযোগ যাতে প্রকৃতই কৃষকরা পান তার পরিকল্পনা। প্রতিটি ফসলের এম এস পি ঘোষণা করে, প্রকৃত কৃষকদের থেকে সরাসরি সরকারের কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা। সেটা যেন ধান কেনার মতো না হয়, তা সুনিশ্চিত করা। রেশন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে খাদ্যদ্রব্য ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা। পরিবর্তিত জলবায়ুর উপযুক্ত কৃষি পদ্ধতির পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য বাজার অর্থনীতিতে এর কোনও নিদান নেই। সেখানে কেবলই আমাদের সর্বনাশ করে, কর্পোরেটদের পৌষমাসের আয়োজন।

বীরভূমে দেউচা-পাঁচামির পরিকল্পিত কর্মক্ষেত্রে চাকরির সম্ভাবনা

বীরভূমের দেউচা-পাঁচামিতে মাটির তলায় মজুত কয়লাকে ঘিরে রাজ্যে নতুন শিল্পের এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা উত্তোলনে এক লক্ষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোক্ত কর্মক্ষেত্রে ''কবে চাকরি'' এবং ''কত চাকরি''? — এই নিয়ে জল্পনা চলছে। হরিণশিঙা দেওয়ানগঞ্জে কয়লা ভূপৃষ্ঠের উপরতলে রয়েছে বলে এখান থেকেই কয়লা উৎপাদন শুরু হবে, ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই ব্লকে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টন, যা রানিগঞ্জের কয়লাখনির অঞ্চলের চার শতাংশ। রানিগঞ্জে কয়লা খনি শিল্পে কর্মসংস্থান প্রায় ৭৫ হাজার, তার মধ্যে ৫৩ হাজার স্থায়ী শ্রমিক। হরিণশিঙায় খোলা মুখ খনি হলে পাঁচ-ছশো ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমেই কয়লা উত্তোলন সম্ভব, গোটা প্রকল্পে প্রয়োজন এর দশগুণ। কোনও বড় বেসরকারি সংস্থা কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব নিলে। যন্ত্রের অধিক ব্যবহারই প্রত্যাশিত, সেক্ষেত্রে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা চলতে পারে—কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার বিষয় বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসকারী যে অঘটন ঘটবে তাকে রাজ্য সরকার তেমন কোনই গুরুত্ব দিচ্ছে না। খোলামুখ খনি এক ভয়ঙ্কর প্রকল্প। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ ও ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে আনার যে আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ভারত সরকার সাক্ষর করেছে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে দেউচা পাঁচামি প্রকল্প। এমন এক পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-